মাযহাব বিরোধিতার খণ্ডন

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি

মাযহাব বিরোধিতার খণ্ডন
ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি

SUBUT—1

রমাদান ১৪৩৮
জুন ২০১৭

প্রকাশক
মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

www.facebook.com/SubutOnline
subutonline@gmail.com
+88 01828616067

সুবুতকহন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এই দ্বীন পরিপূর্ণ। জীবনের সার্বিক পরিচালনায় সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা আছে এতে। আর এই দ্বীনের সার্বিক দিক-নির্দেশনার মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্। যুগ যুগ ধরে মহান উলামা হাক এই দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। অন্য কোনো দ্বীন বা মতবাদের প্রচার ও সংরক্ষণে এতো সাবধানতা ও ইখলাসের নমুনা ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেনি। কুরআন ও সুন্নাহ্র গাঠনিক সংরক্ষণের নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোই হলো ফিকহ বা মাযহাব। মাযহাব কোনো দ্বীন নয়, বরং দ্বীন পালনের সহজতম পথ ও পদ্ধতিই হচ্ছে মাযহাব। কালের ক্রমান্বয়ে উম্মাহ্ আজ চারটি সুবিন্যস্ত মাযহাবের গর্বিত অধিকারী। দুঃখজনক ব্যাপার, এই মাযহাবকে কেন্দ্র করে আমাদের মাঝে রয়েছে চরম গোঁড়ামি ও অন্ধত্ব। কেউ কেউ মাযহাবকে হারাম কিংবা শির্ক বলে দিচ্ছেন, কেউ বা নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মানাকেই ওয়াজিব বা ফরজ বলে দিচ্ছেন; প্রতিপক্ষকে এজন্য রীতিমতো ফাসিকও বলে যাচ্ছেন। ফলে প্রান্তিকতা কমছে তো নয়ই, বরং বেড়েই চলেছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ বলেন, 'আমরা ইমামগণের ব্যাপারে নিষ্পাপ হবার আকিদাহ্ পোষণ করি না বরং আমরা মনে করি, তাঁদের দ্বারা গুনাহ হতে পারে। তারপরও আমরা তাঁদের ব্যাপারে সুউচ্চ মর্যাদার প্রত্যাশা রাখি; যেহেতু আল্লাহ্ তাঁদেরকে নেক আমাল এবং উত্তম আদর্শে বিশেষিত করেছেন। নিশ্চয়ই তাঁরা কোনো গুনাহের ওপর অনড় ছিলেন না। আর তাদের মর্যাদা সাহাবিগণের চেয়ে উচ্চতর নয়। ফাত্ওয়া, বিচার-আচার এবং নিজেদের রক্ত ও অন্যান্য বিষয়ে তারা যেসব ইজতিহাদ করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে এ কথাই প্রযোজ্য। উল্লিখিত হাদিস পরিত্যাগকারী ইমামের ব্যাপারে আমরা বিশ্বাস রাখি তিনি মাযুর, বরং তিনি তার ইজতিহাদের কারণে অবশ্যই প্রতিদানপ্রাপ্ত। ইমামের ভিন্নমত সহিহ্ হাদিস অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে না— যে ব্যাপারে আমরা জানি যে, সেই সহিহ হাদিসের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ অন্য কোনো বর্ণনা নেই, যা সেই হাদিসের বক্তব্যকে প্রতিহত করে। আমরা বিশ্বাস করি, উম্মাহ্র ওপর সেই সহিহ্

হাদিসের আলোকে আমল করা এবং তা প্রচার করা ওয়াজিব। আর আমাদের এ বিশ্বাস লালন করার ক্ষেত্রে কোনো ইমামের ভুল ইজতিহাদ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না। এটা এমন বিষয়, যাতে আলিমগণের কোনো মতবিরোধ নেই।'[১]

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি— হাম্বলি মাযহাবের বিদগ্ধ একজন ফকিহ্, মুজতাহিদ ইমাম। এ বিষয়ের ওপর তাঁর লেখা 'الرَّدُّ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ' এর অনুবাদই হলো 'মাযহাব বিরোধিতার খণ্ডন'। মূল রিসালাহ্য় টীকা ছিলো না, টীকাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। ভাষান্তরে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। তারপরও যেকোনো ধরনের ভুল পেলেই আমাদের জানাবেন; ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে আমরা আবারও এর বিশুদ্ধ সংস্করণ বের করবো। অনুরোধ, আপনাদের দুয়ায় সুবুতকে শরিক রাখবেন।

আবু বারিরাহ্
সম্পাদক, সুবুত

---

[১] রাফয়ুল মালাম আনিল আয়িম্মাতিল আলাম— পৃষ্ঠা: ৪৫, মাকতাবাতুশ শামিলাহ্ সংস্করণ

লেখক পরিচিতি

নাম: আব্দুর রহমান
উপনাম: আবুল ফারজ
উপাধি: যাইনুদ্দিন
জন্মস্থান: বাগদাদ, ইরাক
জন্মসন: ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৭৩৬ হিজরি
প্রসিদ্ধ উস্তাদ: ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, ইমাম ইবনুল হাদি, ইমাম ইবনুল আত্তার
প্রসিদ্ধ ছাত্র: ইমাম যারকাশি, ইমাম ইবনুল লাহ্হাম
প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি—

১. জামিয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম
২. শরহুত তিরমিযি
৩. শরহু ইলালিত তিরমিযি
৪. ফাতহুল বারি শরহু সহিহিল বুখারি
৫. আততাওহিদ
৬. লাতায়িফুল মায়ারিফ
৭. আহওয়ালুল কুবুর ওয়া আহওয়ালু আহলিহা ইলান নুশুর
৮. আলইসতিখরাজ লি আহকামিল খারাজ
৯. তাফসিরু ইবনি রাজাব আলহাম্বালি
১০. আহকামুল ইখতিলাফ ফি রুওয়াতি হিলালি যিল হিজ্জাহ
১১. ফাযলু ইলমিস সালাফ আলা ইলমিল খালাফ
১২. যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা
১৩. আলকাওয়ায়িদুল ফিকহিয়া
১৪. কাশফুল কুরবাহ ফি ওয়াসফি আহলিল গুরবাহ
১৫. ইসতিখরাজুল জিদাল মিনাল কুরআনিল কারিম
১৬. ইখতিয়ারুল আওলা ফি শরহি হাদিসি ইখতিসামিল মালায়িল আলা
১৭. যাম্মুল মাল ওয়াল জাহ্
১৮. মাজমুয়ু রাসায়িলি ইবনি রাজাব

আলিমগণের প্রশংসা

হাফিজ ইবনু হাজার ﷺ বলেন, 'তিনি হাদিসশাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। আসমা, রিজাল, ইলাল, তুরুক— সবগুলো শাস্ত্রে এবং অর্থ ও মর্মের জানাশোনায় তাঁর দক্ষতা অনেক।'

ইবনুল ইমাদ হাম্বলি ﷺ বলেন, 'তাঁর ওয়াজের মাজলিসগুলো হতো হৃদয়গ্রাহী। ব্যাপকভাবে তা জনসাধারণের জন্য বারাকাহপূর্ণ ও উপকারী ছিলো। তাঁর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সব ফিরকা একমত। তাঁর ভালোবাসায় মানুষের অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ। তাঁর সত্তায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও উপকারি অনেক গুণের সমন্বয় ঘটেছিলো। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক।'

তিনি আরও বলেন, 'শাইখ যাইনুদ্দিন ইবনু রজব ইরাকি হাম্বলি ﷺ জনসাধারণের অবস্থাদি সম্পর্কে জানতেন না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের কাছে কখনও ছোটাছুটি করতেন না। কাসায়িনে অবস্থিত মাদরাসায়ই তিনি সবসময় পড়ে থাকতেন।'

ইবনু হাজ্জি ﷺ বলেন, 'তিনি হাদিসশাস্ত্র যথার্থভাবে হাসিল করেছেন। ইলাল[২] শাস্ত্রে তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন সবচে বেশি অবগত। হাদিসের তুরুক[৩] সন্ধানে তাঁর ব্যয়িত শ্রম ছিলো অসাধারণ পর্যায়ের। তিনি কারও সাথে মিশতেন না। কোনো মানুষের কাছে ছোটাছুটি করা তাঁর অভ্যাসে ছিলো না। রমাদান মাসে তাঁর ইন্তিকাল হয়। দামেশকে অবস্থানকারী আমাদের অধিকাংশ হাম্বলি বন্ধুগণ তাঁর সোহবতেই ইলম শিক্ষা করেছেন।'

মৃত্যু

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি ১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৭৯৫ হিজরিতে দামেশকে ইন্তিকাল করেন। আলবাবুস সাগিরে ইমাম শিরাযির কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

---

[২] বর্ণনার সূক্ষ্ম ত্রুটি-দোষ

[৩] সূত্র

সূচি

শুরুর কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ্রই জন্য— বরকতপূর্ণ উত্তম অগণিত প্রশংসা, যেমনটা আমাদের রব পছন্দ করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহ্ ﷻ রহমত বর্ষণ করুন তাঁর বান্দা ও রাসুল মুহাম্মাদের ওপর— উম্মি নবি, সর্বশেষ নবি, মুত্তাকিদের মহান ইমাম— যিনি প্রেরিত হয়েছেন সরল সঠিক দ্বীন ও সুসংরক্ষিত চিরস্থায়ী শরিয়াহ্র সাথে, যাঁর উম্মাহ্র মাঝে সবসময় এমন এক দল থাকবে যারা হবে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা কিয়ামতের আগপর্যন্ত তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে— বর্তমান যুগে ইমাম আহমাদ বা অন্য কোনো প্রসিদ্ধ ইমামের মাযহাবের অনুসারী কতেক ব্যক্তি কিছু মাসয়ালায় নিজেদের মাযহাব থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় তাদের ওপর আমি যে আপত্তি জানিয়েছি, এর কারণে আমার ওপর কেউ কেউ আপত্তি তুলেছেন। তারা দাবি করেছেন— এমনটা যে করে তার ওপর আপত্তির কিছু নেই; যে এমন করে সে হয়তো এক্ষেত্রে নিজেই একজন মুজতাহিদ অথবা যে সত্য তার সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে তার অনুসারী কিংবা সে অন্য কোনো মুজতাহিদের মুকাল্লিদ; সুতরাং এ কারণে তার ওপর আপত্তি করা হবে না।

আল্লাহ্র কাছে তাওফিক প্রার্থনা করে এবার আমি আমার বক্তব্য উল্লেখ করবো। তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা আর তাঁর ওপরই ভরসা। আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কোনো কিছু করারই শক্তি কিংবা সামর্থ্য কারও নেই।

আল্লাহ্ ﷻ কর্তৃক দ্বীন সংরক্ষিত

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ﷻ এই উম্মাহ্র জন্য তাদের দ্বীনকে এমনভাবে হিফাজত করেছেন, যেমনটি অন্য কোনো উম্মাহ্র দ্বীনের ক্ষেত্রে করেননি। কারণ, এ উম্মাহ্র মাঝে পুনরায় আর কোনো নবির আবির্ভাব ঘটবে না[৪], যিনি এসে দ্বীনের নিশ্চিহ্নপ্রায় অংশের সংস্কার করবেন; যেমনটা আমাদের পূর্ববর্তী নবিগণের দ্বীনের ক্ষেত্রে হতো— যখনই কোনো নবির তিরোধানের পর তাঁর দ্বীন বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যেতো, তখনই পরবর্তী কোনো নবি এসে পুনরায় সেই দ্বীনের সংস্কার করতেন।

তাই আল্লাহ্ ﷻ নিজেই এ দ্বীন হিফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রতি যুগেই এ দ্বীনের জন্য এমন কিছু ধারক-বাহক সৃষ্টি করেছেন, যারা এই দ্বীনের ইলমকে ধারণ করবেন। তাঁরা একে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত রাখবেন।[৫]

---

[৪] আবু হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন—

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي

'আমি সর্বশেষ নবি। আমার পর আর কোনো নবি নেই।'

(আলমুজামুল আওসাত, তাবারানি: ৩২৭৪; এর সমর্থনে বর্ণিত হাদিস দেখুন, সহিহ্ মুসলিম: ২২৮৬)

[৫] হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন—

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ

'এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তারা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে।' (শারহ মুশকিলিল আসার: ৩৮৮৪; শুয়াবুল ইমান, বাইহাকি; মুকাদ্দিমাতুত তামহিদ)

আর তারাই এই ইলমের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় ও অনুসরণীয়। যে-কেউ ইলমি বিষয়ে কথা বললেই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।'*

আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ্ ﷻ নিজেই তাঁর কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। সুতরাং কেউই তাঁর শব্দাবলির মাঝে কোনোরকমের হ্রাস-বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে না।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন—

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

'আল্লাহ্ ﷻ বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না; তবে আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। একপর্যায়ে যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই ধর্মগুরু হিসেবে গ্রহণ করবে। ফলে তাদেরকেই ফাত্ওয়া জিজ্ঞাসা করা হবে। আর তারা ইলম ছাড়া ফাত্ওয়া দেবে। এভাবে নিজেরাও গোমরাহ হবে, অন্যদেরকেও গোমরাহ করবে।'

(সহিহ্ বুখারি, হাদিস: ১০০; সহিহ্ মুসলিম, হাদিস: ২৬৭৩; মুসনাদু আহমাদ, হাদিস: ৬৮৯৬; আসসুনানুল কুবরা, নাসায়ি, হাদিস: ৫৯০৮; আলমুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক, হাদিস: ২০৪৭১)

* সুরা হিজর— ১৫: ৯

আলকুরআনের সাত হারফ

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সময়ে উম্মাহ্‌কে আরবে প্রচলিত একাধিক হারফে[৭] কুরআন পড়াতেন, যাতে করে উম্মাহ্‌র জন্য কুরআন হিফজ করা এবং এর ইলম অর্জন করা সহজ হয় আর যেহেতু তাঁদেরর মাঝে বয়স্ক মানুষ ছিলো, নারী-পুরুষ ছিলো এবং কখনও কোনো কিতাবই পড়েনি— এমন মানুষও ছিলো; তাই রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাদের হিফজের সুবিধার্থে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আরবে প্রচলিত সাত হারফে কুরআন পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। যেমনটি উবাই ইবনু কাব ؓ এবং অন্যান্যদের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।[৮] এরপর যখন পৃথিবীর বিভিন্ন

---

[৭] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْرَأَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيْدُهُ وَيَزِيْدُنِيْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

'ইবনু আব্বাস ؓ বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'জিবরিল আমাকে এক হারফে কুরআন পড়ালেন আমি এ বিষয়ে পুনরায় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি (আল্লাহ্‌র নির্দেশে) একাধিক হারফে পড়ালেন। আমিও আরও বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করতে থাকলাম। অবশেষে সাত হারফে পড়ার অনুমতি মিললো।' '

(সহিহ্ বুখারি: ৪৭০৫; সহিহ্ মুসলিম: ৮১৯)

[৮] উবাই ইবনু কাব ؓ-র হাদিসটির আরবি পাঠ নিম্নরূপ—

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِيْ غِفَارٍ، قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِيْ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ». فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِيْ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ». ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِيْ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ». ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوْا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوْا.

অঞ্চল ও ভূখণ্ডে ইসলাম ব্যাপকতা লাভ করলো এবং মুসলমানরা দূর-দূরান্তের দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো, তখন দেখা গেলো, প্রত্যেক জনপদবাসী সেভাবেই কুরআন পড়ছে, যেভাবে তাদের কাছে কুরআন পৌঁছেছে। সে সময় আলকুরআনের পঠন-পদ্ধতি নিয়ে মুসলিমদের মাঝে মারাত্মক মতবিরোধ দেখা দিলো। উসমান ﷺ-র যুগে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-র মহান সাহাবিগণ আশংকা করলেন, অবস্থা যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে সমূহ আশংকা রয়েছে যে, পূর্ববর্তী উম্মাহ্র মতো এই উম্মাহ্ও আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাব নিয়ে লড়াই-মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। তাই তাঁরা উম্মাহ্র প্রতি কল্যাণকামিতার দাবিতে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, আলকুরআনের অন্যান্য সবপ্রকারের হারফ মিটিয়ে মাত্র একপ্রকারের হারফ* বাকি রাখা হবে।

'উবাই ইবনু কাব ﷺ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বনু গিফারের জলাধারের কাছে ছিলেন। তখন জিবরিল ﷺ তাঁর কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহ্ আপনাকে আদেশ দিচ্ছেন, আপনার উম্মাহ্ এক হারফে কুরআন পড়বে।' রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আমি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা ও অনুগ্রহ চাচ্ছি। আমার উম্মাহ্ তো এতে সক্ষম হবে না।' এরপর জিবরিল ﷺ দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে আসলেন। এবার বললেন, 'আল্লাহ্ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আপনার উম্মাহ্ দু'হারফে কুরআন পড়বে।' রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আমি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা ও অনুগ্রহ চাচ্ছি। আমার উম্মাহ্ তো এতে সক্ষম হবে না।' এরপর জিবরিল ﷺ তৃতীয়বার তাঁর কাছে আসলেন। এবার বললেন, 'আল্লাহ্ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আপনার উম্মাহ্ তিন হারফে কুরআন পড়বে।' রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আমি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা এবং অনুগ্রহ চাচ্ছি। আমার উম্মাহ্ তো এতে সক্ষম হবে না।' এরপর জিবরিল ﷺ চতুর্থবার তাঁর কাছে আসলেন। এবার বললেন, 'আল্লাহ্ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আপনার উম্মাহ্ সাত হারফে কুরআন পড়বে। আর তারা (এই সাত হারফের) যে হারফেই কুরআন পড়বে, তা বিশুদ্ধ বলেই সাব্যস্ত হবে।' ' (সহিহ্ মুসলিম: ৮২১)

* সাত হারফে কুরআন পড়ার বৈধতার কথা ওপরে আলোচিত হলো। সাত হারফ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ইমাম কুরতুবি ﷺ তাঁর বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ 'আলজামি লি আহকামিল কুরআন'-এ সুরা মুযযাম্মিলের শেষ আয়াতের তাফসিরে প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'সাত হারফ দ্বারা কী উদ্দেশ্য এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে চরম ইখতিলাফ রয়েছে। তাফসিরু ইবনু হিব্বানে ইমামগণের পঁয়ত্রিশটি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে— অধিকাংশ আহলুল ইলমের অভিমত, যাদের মাঝে আছেন সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা, আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওয়াহ্ব, তাবারি, তহাবি রহিমাহমুল্লাহ্ সহ আরও অনেকে। তাঁদের বক্তব্য হলো, সাত হারফ দ্বারা সাত সুরত উদ্দেশ্য (অর্থাৎ একটি শব্দকে একাধিক সুরতে পড়া, যেমন, নুনশিযুহা শব্দকে নানশুরুহা পড়া। সুরা বাকারা: ২৫৯); শব্দে কিছুটা ভিন্নতা

এই এক হারফের বাইরে অন্যান্য হারফে লিখিত যতো মুসহাফ ছিলো, তাঁরা সব জ্বালিয়ে ফেললেন। উসমান ﵁-র অনন্য মহৎ কাজগুলোর মাঝে এই এক হারফে কুরআন সংকলনের কাজটিকে গণ্য করা হয়, যার জন্য আলি ﵁, হুযাইফা ﵁ সহ অনেক বড় বড় সাহাবি তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

উমার ﵁ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-র সময়েই কুরআনের একটি আয়াত ভিন্নভাবে পড়ার কারণে হিশাম ইবনু হাকিম ইবনু হিযামের ওপর কড়া আপত্তি জানিয়েছিলেন।[১০] কুরআন-পঠনের পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে উবাই ইবনু কাব ﵁-র মনেও মারাত্মক সংশয় জেগেছিলো, যার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন।[১১] রাসুলের

থাকলেও যার সবগুলোর অর্থ কাছাকাছিই।' এরপর তিনি এই বিশুদ্ধতম মতের পক্ষে দলিলসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। বিস্তারিত জানতে তাফসিরু কুরতুবি দ্রষ্টব্য।

[১০] ইমাম বুখারি তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেন, উমার ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-র জীবদ্দশায় আমি হিশাম ইবনু হাকিম ইবনু হিযামকে একবার সুরা আলফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আমি তখন তার কিরাত শ্রবণের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করলাম। তখন আমি লক্ষ করলাম, সে অনেক রকম হারফে কুরআন তিলাওয়াত করছে, যেসব হারফে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুরআন পড়াননি। সলাতের মধ্যেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলাম। অবশেষে সে সালাম ফিরিয়ে সলাত শেষ করলো। আমি তখন তার চাদর পেঁচিয়ে ধরে বললাম, 'আমি তোমাকে যে সুরা পড়তে শুনলাম, এই সুরা তোমাকে কে পড়িয়েছে?' সে বললো, 'রাসুলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তা পড়িয়েছেন।' আমি বললাম, 'তুমি মিথ্যে বলছো। কেননা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ নিজে আমাকে তা অন্যভাবে পড়িয়েছেন, যা তোমার পঠিত কিরাত থেকে ভিন্ন।' তখন আমি তাকে টেনে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-র কাছে নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই আমি তাকে সুরা আলফুরকান পড়তে শুনেছি এমন হারফে, যা আপনি আমাকে পড়াননি।' তখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'তাকে ছাড়ো। হিশাম, তুমি পড়ো।' সে তখন রাসুলের সামনে সেভাবেই পড়লো, যেভাবে আমি তাকে পড়তে শুনেছি। তখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'কুরআন এভাবেই নাযিল হয়েছে।' এরপর তিনি বললেন, 'উমার, এবার তুমি পড়ো।' রাসুল ﷺ আমাকে যেভাবে পড়িয়েছিলেন, আমি সে কিরাতই পড়লাম। তখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'কুরআন এভাবেই নাযিল হয়েছে। নিশ্চয়ই এই কুরআন সাত হারফে নাযিল হয়েছে। সুতরাং যেভাবে সহজ লাগে, তোমরা সেভাবেই তা পাঠ করো।' '

(সহিহ্ বুখারি: ৪৭০৬; সহিহ্ মুসলিম: ৮১৮; সুনানু তিরমিযি: ২৯৪৩)

[১১] ইমাম মুসলিম ﵀ তাঁর সূত্রে উবাই ইবনু কাব ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি মসজিদে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সলাত আদায় করলো। তখন সে এমন কিরাত পড়লো, যার কারণে আমি তার ওপর আপত্তি করলাম।

ওয়াহি লেখক সাহাবিদের একজন— ইমান যার অন্তরে বদ্ধমূল হয়নি— শুধু এ কারণে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে এবং মুরতাদ অবস্থায়ই ইহধাম ত্যাগ করেছে[১২]।

এরপর আরেক ব্যক্তি এসে প্রথমজন থেকে ভিন্ন আরেক কিরাত পড়লো। তারপর আমরা যখন সলাত শেষ করলাম, আমরা সবাই রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-র কাছে আসলাম। তখন আমি বললাম, 'এই ব্যক্তি এমন কিরাত পড়েছে, যাতে আমার আপত্তি জেগেছে। এরপর এই ব্যক্তি এসে আবার আগেরজন থেকে ভিন্ন কিরাত পড়েছে।' তখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে নির্দেশ দিলে তারা তাঁর সামনে কিরাত পাঠ করলো। রাসুল তাদের পঠিত কিরাতকে সুন্দর বললেন। তখন আমার ভেতরে এমন অস্থিরতা ও অস্বীকার করার মানসিকতা জেগে ওঠলো, যেমনটা জাহিলি যুগেও কখনও হয়নি। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ যখন বুঝতে পারলেন আমাকে কী অবস্থা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তখন তিনি আমার বুকে আঘাত করলেন। তখন আমি ঘামে ভিজে গেলাম। মনে হচ্ছিলো, ভয়ের প্রচন্ডতায় আমি আল্লাহ্‌র দিকে তাকিয়ে আছি। তখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, 'হে উবাই, আমার কাছে প্রথমে বার্তা প্রেরণ করা হলো—তুমি এক হারফে কুরআন পাঠ করো। আমি আর্জি পেশ করলাম— আমার উম্মাহ্‌র জন্য সহজ করুন। দ্বিতীয়বার বার্তা এলো— তুমি দু'হারফে কুরআন পাঠ করো। আমি পুনরায় দরখাস্ত করলাম— আমার উম্মাহ্‌র জন্য সহজ করুন। তৃতীয়বার বার্তা এলো— তুমি সাত হারফে কুরআন পড়ো; (এরপর আমাকে বলা হলো) প্রতিটি বার্তার জন্য তোমার একটি করে প্রার্থনা গ্রহণ করা হবে, যা তুমি আমার কাছে চাইবে। তখন আমি দু'টো দুয়া করলাম— হে আল্লাহ্, আমার উম্মাহ্‌কে ক্ষমা করে দিন; হে আল্লাহ্, আমার উম্মাহ্‌কে ক্ষমা করে দিন। আর তৃতীয় দুয়াটিকে সেদিনের জন্য বিলম্বিত করলাম, যেদিন সবাই আমার কাছে আগ্রহ নিয়ে ছুটে আসবে, এমনকি ইবরাহিম আ.ও।' ' (সহিহ্ মুসলিম: ৮২০; মুসনাদু আহমাদ: ২০৬৬৭; সুনানু নাসায়ি: ৯৪০)

[১২] ইমাম বুখারি ﵀ তাঁর সহিহ্ গ্রন্থে আনাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, 'এক ব্যক্তি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলো। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করলো। সুরা আলবাকারা ও আলুইমরান পাঠ করলো। সে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-র জন্য ওয়াহি লেখার কাজ করতো। এরপর পুনরায় খ্রিস্টান হয়ে গেলো। এরপর সে বলে বেড়াতো— আমি যা কিছু লিখে দিয়েছি, এর বাইরে মুহাম্মাদ কিছুই জানে না। তারপর আল্লাহ্ তাকে মৃত্যু দিয়ে দিলেন। তখন মানুষেরা তার দাফনকার্য সম্পন্ন করলো। পরের দিন সকাল বেলা দেখা গেলো, যমিন তাকে তার গর্ত থেকে বের করে দিয়েছে। তখন মানুষজন বলাবলি শুরু করলো— এটা মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের কাজ; যেহেতু সে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে, তাই তারা তার কবর খুঁড়ে লাশ বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারা পুনরায় গর্ত করে মাটির গভীরে তার লাশ রাখলো। পরবর্তী সকালে দেখা গেলো, যমিন পুনরায় তাকে তার গর্ত থেকে বের করে দিয়েছে। এবারও তারা বলাবলি করলো— এটা মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের কাজ; যেহেতু সে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে, তাই তারা তার লাশকে কবর থেকে বের করে রেখেছে। এবার তারা যতোটুকু সাধ্য ছিলো মাটি খুঁড়ে একেবারে গভীরে তার লাশ দাফন করলো। পরবর্তী সকালেও দেখা

গেলো, যমিন এবারও তাকে তার গর্ত থেকে বের করে দিয়েছে। তারপর তারা বুঝলো, এটা কোনো মানুষের কাজ নয়। তাই তারাও লাশ ফেলেই রাখলো।'

(সহিহ্ বুখারি: ৩৪২১; সহিহ্ মুসলিম: ২৭৮১)

সহিহ্ মুসলিমের বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে যে, সে ছিলো বনু নাজ্জার গোত্রের। সহিহ্ মুসলিমে এ বর্ণনাটিকে মুনাফিকদের সিফাত ও আহকাম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ ﷺ 'আসসারিমুল মাসলুল' গ্রন্থে এই অভিশপ্ত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। (দেখুন— আসসারিমুল মাসলুল: ১/১২২)

এখানে অনেকেরই একটি বিভ্রান্তি ঘটে। তারা এই মুনাফিকের নাম আব্দুল্লাহ্ ইবনু সাদ ইবনু আবি সার্হ বলে উল্লেখ করেন। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা দুজন সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি। প্রথমজন বনু নাজ্জার গোত্রের এক খ্রিস্টান, যে সাময়িক সময়ের জন্য নিজের দুষ্কৃতি ও মন্দ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ইসলামের ছত্রছায়ায় এসেছিলো। আর দ্বিতীয়জন এক মহান সাহাবি, শয়তান মাঝে যার সামান্য পদস্খলন ঘটিয়েছিলো। প্রসঙ্গক্রমে নির্ভরযোগ্য বর্ণনার আলোকে আমরা তার জীবনীর প্রতিও সামান্য আলোকপাত করছি। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু সাদ ইবনু আবি সার্হ ﷺ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-র জন্য ওয়াহি লিপিবদ্ধ করতেন। পরবর্তীকালে শয়তান তার পদস্খলন ঘটালো। তিনি কাফিরদের সাথে যুক্ত হয়ে গেলেন। মক্কা বিজয়ের দিন (মুরতাদের শাস্তিস্বরূপ) রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাকে হত্যা করার বিধান জারি করলেন। উসমান ইবনু আফফান ﷺ তার জন্য আশ্রয়প্রার্থনা করলেন তারপর রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আশ্রয় দিলেন।' (সুনানু নাসায়ি: ৪০৬৯; সুনানু আবি দাযুদ: ৪৩৫৮)

সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস ﷺ-র বর্ণনায় ঘটনাটি আরেকটু বিস্তারিতভাবে এসেছে। তিনি বলেন, 'মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ সবার জন্য নিরাপত্তা ঘোষণা করেছেন, তবে সাতজনকে এই বিধানের বাইরে রেখেছেন— চারজন পুরুষ, দুজন নারী। তিনি তাদের নামও উল্লেখ করে দিয়েছেন এবং সেই ঘোষণায় পঞ্চম ব্যক্তি ছিলো ইবনু আবি সার্হ। ইবনু আবি সার্হ উসমান ইবনু আফফান ﷺ-র কাছে আত্মগোপন করলেন। (উল্লেখ্য, তিনি উসমান ﷺ-র দুধভাই ছিলেন) রাসুলুল্লাহ্ ﷺ যখন মানুষদেরকে বাইআতের উদ্দেশে আহ্বান করলেন, তখন উসমান রা. তাকে এনে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-র সামনে দাঁড় করালেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ্র নবি, আপনি আব্দুল্লাহ্কে বাইয়াত করে নিন।' রাসুলুল্লাহ্ ﷺ মাথা উঁচিয়ে তার দিকে তিনবার তাকালেন। প্রতিবারই তিনি বাইয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনবারের পরে তাকে বাইয়াত করে নিলেন। এরপর তিনি সাহাবিদের অভিমুখী হয়ে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কি একজন বিচক্ষণ লোকও নেই— যখন আমাকে দেখলো, আমি তার বাইয়াত গ্রহণ করা থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছি— তখন উঠে তাকে হত্যা করে ফেলতো?!' সাহাবিগণ বললেন, 'আমরা তো আপনার অন্তরের কথা জানি না, হে আল্লাহ্র রাসুল। আপনি একবার আমাদের দিকে চোখের দ্বারা ইঙ্গিত

এসব তো রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-র যুগেরই কথা। তাহলে তাঁর পরবর্তী উম্মাহ্র ব্যাপারে কী আশঙ্কা-ধারণা করা যায়, যদি কুরআনের পঠন-পদ্ধতির এই ভিন্নতা উম্মাহ্র মাঝে তাঁর পরেও বাকি থেকে যায়! এজন্য উম্মাহ্র অধিকাংশ আলিম-ফকিহ্গণ— উসমান ﷺ সকল সাহাবির সম্মতিক্রমে মুসলমানদেরকে যে হারফের ওপর ঐক্যবদ্ধ করে গেছেন— এর বাইরের অন্য সব হারফ পরিত্যাগ করেছেন এবং সেসবের আলোকে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।[১৩]

করতেন।' তিনি বললেন— কোনো নবির জন্য শোভনীয় নয় যে, তার খেয়ানতকারী দৃষ্টি থাকবে।' (সুনানু নাসায়ি: ৪০৬৭; সুনানু আবি দায়ুদ: ২৬৮৩)

ইমাম যাহাবি ﷺ বলেন, 'মক্কা বিজয়ের পরে তিনি আর কখনও সীমালঙ্ঘন করেননি অথবা এমন কিছুও করেননি, যার কারণে তাকে শাস্তির সম্মুখীন করা যায়। তিনি শ্রেষ্ঠ ও বিদগ্ধ সাহাবিগণের মাঝে অন্যতম।' (দেখুন— সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৩৪; আলইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব: ৩/৫২; আলইসাবাহ ফি তাময়িযিস সাহাবাহ: ৪/১১০)

ইমাম যাহাবি ﷺ উপরিউক্ত আলোচনার পরে বলেন, 'উসমান ﷺ তাঁকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। যাতুস সাওয়ারি যুদ্ধে তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আফ্রিকায় যুদ্ধ পরিচালনা করে তিনি অনেক শহরও বিজয় করেছিলেন। আলী ﷺ ও মুয়াবিয়া ﷺ-র মধ্যে সংঘটিত ফিতনা থেকে তিনি নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। ফিলিস্তিনের রামলা শহরে সলাতরত অবস্থায় ডান দিকে সালাম ফেরানোর পরে বাম দিকে সালাম ফেরানোর আগমুহূর্তে আল্লাহ্ তাঁকে আপন সান্নিধ্যে নিয়ে যান।' (প্রাগুক্ত)

উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, ওয়াহি লেখক দুজনের জীবনে মুরতাদ হওয়ার ঘটনা ঘটেছিলো। একজন সেই অবস্থায়ই দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। তার করুণ পরিণতি দুনিয়াতেই মানুষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে এবং তার নাম কী ছিলো, তা হাদিস কিংবা ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় না, আরেকজন সাময়িকভাবে পদস্খলনের শিকার হলেও মক্কা বিজয়ের সময় তার খাঁটি তাওবাহ্ নসিব হয় এবং ইমানের সাথে তিনি ইন্তেকাল করেন। আর তাঁর নাম ছিলো আব্দুল্লাহ্ ইবনু সাদ ইবনু আবি সারহ ﷺ। এখানে দুজন সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তিকে অনেক এক ব্যক্তি ভেবে বসেন, তাই আমরা বিশুদ্ধ বর্ণনার আলোকে বিষয়টিতে সামান্য আলোচনা করেছি।

[১৩] উল্লেখ্য যে, সাত হারফ এবং প্রসিদ্ধ সাত কিরাত বা দশ কিরাত কিন্তু এক বিষয় নয়। হারফের ভিন্নতা মানে শব্দের ভিন্নতা— এক মুসহাফে একাধিক শব্দের প্রয়োগ, যদিও তার অর্থ কাছাকাছিই। যেমন নুনশিযুহা ও নানশুরুহা (সুরা বাকারা: ২৫৯)। আর কিরাতের বিভিন্নতা হলো, উচ্চারণের বিভিন্নতা— একই শব্দ, কিন্তু তা পড়ার পদ্ধতি একাধিক। যেমন, ইয়াতহুরনা এবং ইয়াত্তাহ্হারনা (সুরা বাকারা: ২২২)। একাধিক কিরাতে কুরআন পড়ার বৈধতার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু উসমান ﷺ সাহাবিগণের সম্মিলিত

কিছুসংখ্যক আলিম অবশ্য এর অবকাশও দিয়েছেন। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ থেকেও এ বিষয়ে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়; যদিও তাঁদের মাঝে আবার এ বিষয়ে এসে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে যে, অন্যান্য হারফে কুরআন পড়ার বৈধতা কি সলাতে এবং সলাতের বাইরে সবক্ষেত্রে, নাকি শুধু সলাতের বাইরে?

যাইহোক, তবে এ বিষয়ে উম্মাহ্ কোনো মতবিরোধ করবে না, যদি কেউ আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসয়ুদ رضي الله عنه বা অন্য কোনো সাহাবি থেকে বর্ণিত কিরাতে কুরআন পড়ে— যা সর্বসম্মতিক্রমে উম্মাহ্র স্থিরকৃত মুসহাফের[১৫] বিপরীত— আর সে দাবি করে যে, এটাই যাইদ বিন সাবিতের কিরাত, যার ওপর উসমান رضي الله عنه উম্মাহ্কে ঐক্যবদ্ধ করে গেছেন, অথবা দাবি করে যে, কিরাত হিসেবে যাইদ বিন সাবিতের হারফের থেকে এটা উত্তম, তবে নিঃসন্দেহে সে জালিম সাব্যস্ত হবে, সীমালঙ্ঘনকারী প্রতীয়মান হবে এবং শাস্তির উপযুক্ত হবে। এ এমন বিষয়, যে ব্যাপারে উম্মাহ্র দুজন ব্যক্তিও মতবিরোধ করবে না।

যখন কেউ ইবনু মাসয়ুদ رضي الله عنه বা অন্য কারও কিরাত পড়বে এবং নিজেও এ কথা স্বীকার করবে যে, তা ইবনু মাসয়ুদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হারফ, উসমান رضي الله عنه-র মুসহাফ নয়— কেবল তখনই এ মতটি ইমামগণের মতভিন্নতার ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হবে।

সিদ্ধান্তক্রমে মুসলমানদেরকে যে হারফের ওপর রেখে গেছেন, এর বাইরের কোনো হারফের আলোকে কুরআন পড়ার বৈধতার ব্যাপারেই ইমামগণের উপরিউক্ত ইখতিলাফ। অধিকাংশ আলিমের মতেই তা জায়িয নেই। (দেখুন— আলমুরশিদুল ওয়াজিয, আবু শামাহ)

[১৫] আলকুরআনের নুসখা বা কপিকে মুসহাফ বলা হয়।

সুন্নাহ্ও কুরআনের মতোই সংরক্ষিত

নবি ﷺ-র সুন্নাহ্ও উম্মাহ্র মাঝে সিনায় সিনায় সেভাবেই সংরক্ষিত হয়েছে যেভাবে আলকুরআন সংরক্ষিত হয়েছে। আলিমগণের মাঝে কেউ অবশ্য কুরআনের মতো করে সুন্নাহ্ও লিখে সংরক্ষণ করতেন আর কেউ সুন্নাহ্কে পত্রস্থ করতে বারণ করতেন। আর এ ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, মেধা ও স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে প্রচুর পার্থক্য-ভিন্নতা রয়েছে। সাহাবাযুগের পর গোমরাহ বিদয়াতি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, যারা দ্বীনের মাঝে এমন সব বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটায়, যা আদৌ দ্বীনের অংশ নয় এবং তারা স্বজ্ঞানে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-র ওপর মিথ্যারোপ করে হাদিস রচনা করে। তখন আল্লাহ্ ﷻ সুন্নাহ্র হিফাজতের জন্য এমন সব মানুষদেরকে দাঁড় করিয়ে দেন, যারা হাদিসের মাঝে ঢুকে পড়া মিথ্যা বর্ণনা, ভুলভ্রান্তি সব আলাদা করে হাদিসশাস্ত্রকে পরিমার্জিত করে ফেলেন।

এরপর আলিমগণ হাদিসশাস্ত্রের অনেক কিতাব রচনা করেন। হাদিসশাস্ত্রে রচিত এসব কিতাবাদি বেশ প্রসার লাভ করে। তাঁরা নিজেরাও শাগরেদদেরকে এসব কিতাবের দারস-তালিম দেন। অবশেষে হাদিসের ক্ষেত্রে মানুষের নির্ভরযোগ্যতা দুই কিতাবের ওপর নিবদ্ধ হয়— সহিহুল ইমাম বুখারি এবং সহিহুল ইমাম মুসলিম। এ দুই কিতাবের পরবর্তী স্তরে মানুষের নির্ভরতা কুতুবুস সিত্তাহ্র অন্য কিতাবগুলোর ওপর— সুনানু আবি দায়ুদ, জামি তিরমিযি, সুনানু নাসায়ি এবং সুনানু ইবনি মাজাহ্—নিবদ্ধ হয়। সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম রচিত হওয়ার পরও সহিহ্ হাদিসের অনেক সংকলন রচিত হয়েছে, কিন্তু তা এই দুই মহান শাইখের কিতাবের স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। এজন্য আলিমগণ তাদের ওপর আপত্তি করেছেন, যারা সহিহাইনের ওপর ইসতিদরাক[১৫] করে কিতাব রচনা করেছেন এবং নিজেদের রচিত কিতাবের নাম মুসতাদরাক বলে উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো হাফিজুল হাদিস তো এতোটুকু পর্যন্ত

---

[১৫] ইলমুল হাদিসের পরিভাষায় ইসতিদরাক বলা হয়— এমন সব হাদিস সংকলিত করা, যা কোনো মুসান্নিফের শর্তে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ কিতাবে তা উল্লেখ করেননি। আর সংকলিত কিতাবকে বলা হয় মুসতাদরাক।

বলেছেন— সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিমের মুসতাদরাকগুলোতে এমন একটি হাদিসও নেই যা বুখারি ও মুসলিমের শর্তে উপনীত। অন্যান্য ইমামগণ এ বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মুসতাদরাকগুলোর অসংখ্য হাদিস ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ্ এর স্তরে উন্নীত। এ বিষয়ে চূড়ান্ত তাহকিক হলো, মুসতাদরাকসমূহের অনেক হাদিসই এমন, যা সহিহ্ এবং ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম ছাড়া অন্যান্য ইমামগণের শর্তে উন্নীত; এমনকি ইমাম আবু ইসা তিরমিযি এবং তাঁর সমপর্যায়ের ইমামগণের শর্তেও উন্নীত। তবে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের শর্তে উন্নীত হয় এমন কোনো হাদিসই মুসতাদরাকসমূহে নেই। [১৬]

---

[১৬] মুসতাদরাক গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচে প্রসিদ্ধ হলো আলমুসতাদরাকু লিল হাকিম। এ কিতাব সম্পর্কে ইমাম আব্দুল হাই কাত্তানি ﷺ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আররিসালাতুল মুসতাতরিফা'য় আলোচনা করেছেন। সেখানে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, আবু সাদ আলমালিনি ﷺ দাবি করেন, ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের শর্তে উন্নীত হয়, এমন একটি হাদিসও মুসতাদরাকে হাকিমে নেই। ইমাম যাহাবি ﷺ তার এই দাবি খণ্ডন করে বলেন, এটা সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি; বরং আলমুসতাদরাকু লিল হাকিমে অসংখ্য হাদিস এমন, যা তাঁদের শর্তে উন্নীত। আর অনেক হাদিস এমন, যা তাঁদের একজনের শর্তে উন্নীত। এর সমষ্টি বোধহয় পুরো কিতাবের অর্ধেক পরিমাণ হবে। আর পুরো কিতাবের এক চতুর্থাংশ এমন, যার সনদ সহিহ্, তবে তাতে কোনো ইল্লত (সূক্ষ্ম ত্রুটি) রয়েছে। আর বাকি এক চতুর্থাংশ হলো পরিত্যাজ্য— মুনকার, ওয়াহি এবং সহিহ্ নয় এমন সব রেওয়ায়াত। এমনকি কিছু কিছু জাল বর্ণনাও রয়েছে। ইমাম হাকিমের শিথিলতার কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়, তিনি এই কিতাব জীবনের শেষ বয়সে রচনা করেছিলেন। যে সময়ে তাঁর মাঝে গাফলত দেখা দিয়েছিলো, তার আগের অবস্থাও বদলে গিয়েছিলো; অথবা এই কিতাব রচনার পর তা সম্পাদনা ও পরিমার্জন করার সুযোগ তাঁর আর হয়ে ওঠেনি। এর প্রমাণ হলো— কিতাবের প্রথম এক পঞ্চমাংশে দেখা যায় যে, তাঁর শিথিলতা তুলনামূলক কম। হাফিজ ইবনু হাজার ﷺ বলেন, 'দ্বিতীয় খণ্ডের প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি— যা পুরো মুসতাদরাকের প্রায় এক ষষ্ঠমাংশ— পর্যন্ত ইমাম হাকিমের ইমলা সম্পন্ন হয়েছে (অর্থাৎ তিনি নিজে ছাত্রদেরকে দিয়ে লেখিয়েছেন।)।' তিনি বলেন, 'এ ছাড়া বাকি কিতাব তাঁর কাছ থেকে অনুমতিক্রমে লেখা হয়েছে। তিনি নিজে যে অংশ ইমলা করিয়েছেন, অপরাপর অংশের তুলনায় এর মাঝে শিথিলতা অনেক অনেক কম।'

(দেখুন— আররিসালতুল মুসতাতরিফা: ২১)

এই শাস্ত্রে যাদের বিজ্ঞতা ও জানাশোনা সুপরিচিতি লাভ করেছে এমন হাদিসবিশেষজ্ঞ ছাড়া— আদতে তাদের সংখ্যা খুব সীমিত— এরপর আর কারও থেকে সহিহ্ যয়িফের বিধান গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া অন্যসব মানুষজন উল্লিখিত কিতাবগুলোর ওপর আমল করেছেন এবং কোনো হাদিসকে সেই কিতাবগুলোর দিকে নিসবত করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন।

ফিকহ্ সংকলন

নিঃসন্দেহে অনেক বিধিবিধান এবং হালাল হারামের অসংখ্য মাসায়িলের ক্ষেত্রে সাহাবা তাবিয়িন ও তাঁদের পরবর্তীগণ ব্যাপক মতানৈক্য করেছেন। প্রাথমিক যুগগুলোতে রীতি ছিলো— যারাই ইলম ও দ্বীনদারির ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করতেন, এ ধরনের মতানৈক্যপূর্ণ মাসয়ালাগুলোতে প্রত্যেকে নিজ দৃষ্টিতে যা হক ও গ্রহণীয় মনে করতেন, তার আলোকেই ভিন্ন ভিন্ন ফাত্ওয়া দিতেন। জমহুর থেকে ভিন্নমত পোষণ করার কারণে অপরাপর আলিমগণের চরম আপত্তির শিকার হয়েছেন, এমন আলিমদের সংখ্যাও একেবারে কম ছিলো না। যেমন ইবনু আব্বাস ﵄-র ওপর অসংখ্য মাসয়ালায় আপত্তি করা হয়েছে এবং সেসব মাসয়ালার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীদের ওপর আপত্তির মাত্রা ছিলো তাঁর চেয়েও বেশি। এমনকি ইবনু জুরাইজ ﵀ যখন বসরায় আগমন করলেন, মানুষজন তাঁকে দেখে স্থানীয় জামে মসজিদে একত্র হয়ে হাত উঠিয়ে তাঁর ওপর বদদুয়া করলো। ইবনু আব্বাস ﵄-র শাগরেদদের থেকে তিনি যে শায মাসয়ালাগুলো গ্রহণ করেছিলেন, তার কারণেই এমনটি ঘটেছিল। আর তাই তাদের কাছ থেকে বের হওয়ার আগেই এর অনেকগুলো মাসয়ালা থেকে তিনি তাঁর ভিন্নমত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

অবস্থা ছিলো এই, অথচ সে সময়ে মানুষের মাঝে দ্বীনদারি ও তাকওয়া প্রবল ছিলো! এর একটি ভালো দিক ছিলো যে, সে সময়ে ইলম ছাড়া কেউ কথা বলতো না, অযোগ্য কেউ নিজেকে আলোচক হিসেবে ঘোষণা করতো না। এরপর দ্বীনদারি ও তাকওয়া ধীরে ধীরে লোপ পায়। এমন লোকদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে, যারা ইলম ছাড়াই দ্বীনের বিষয়ে কথা বলতে লাগলো এবং অযোগ্য হয়েও নিজেকে যোগ্যদের আসনে অধিষ্ঠিত করে বসলো। এই শেষ যামানায় এসে অবস্থা যদি প্রাথমিক যুগের অবস্থার মতোই থাকতো, প্রত্যেকেই নিজের কাছে যা হক মনে হয় সে আলোকে ফতোয়া দিতে থাকতো, তাহলে নিঃসন্দেহে দ্বীনের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা বিঘ্নিত হতো, হালাল বিধান পরিণত হতো হারামে আর হারাম হয়ে যেতো হালাল। প্রত্যেকেই যার যা ইচ্ছা তা-ই বলতো, এর পরিণতিতে আমাদের দ্বীনের অবস্থাও পূর্ববর্তী আহলুল কিতাবের দ্বীনের মতো হয়ে যেতো। আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ হিকমাহ্‌র দাবি ছিলো যে, তিনি দ্বীনকে

সুবিন্যস্ত ও সুসংরক্ষিত করবেন; সব মানুষের জন্য এমন কজন ফকিহ্ ও মুহাদ্দিস মহান ইমামকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যাদের ইলমি বিজ্ঞতা এবং বিধিবিধান ও ফাত্ওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হবার ব্যাপারে সবার ঐকমত্য থাকবে। তখন সব মানুষ ফাত্ওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের উদ্দেশে প্রত্যাবর্তন করবে, বিধিবিধানের জ্ঞান তাঁদের মাধ্যমেই আহরণ করবে। তাঁদের মাযহাবগুলোকে সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত করবে এবং তাঁদের মূলনীতিসমূহকে লিপিবদ্ধ করে রাখবে এমন কিছু মানুষও আল্লাহ্ ﷻ তৈরি করে দিলেন। এভাবে প্রত্যেক ইমামের মাযহাব, উসুল, কাওয়ায়িদ, অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ সবই সংকলিত হলো; যাতে করে বিধিবিধানের প্রয়োজনে তাদের উদ্দেশে প্রত্যাবর্তন করা যায়, হালাল হারামের মাসায়িলের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মত সংকলিত রূপে থাকে। এটা ছিলো ইমানদার বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ-ভালোবাসার অংশ, এই দ্বীনের সংরক্ষণে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অন্যতম। যদি এমন না হতো, তাহলে আলিম-ভানকারী, আত্মতুষ্ট, দুঃসাহসী প্রত্যেক নির্বোধ থেকে মানুষ দ্বীনি বিষয়ে আশ্চর্য সব কথাবার্তা দেখতে পেতো

এক পাগল দাবি করতো, সে হচ্ছে সব ইমামের শ্রেষ্ঠ ইমাম। আরেক পাগল বলে বসতো, সে হলো উম্মাহ্র রাহবার; একমাত্র সেই এমন, যার কাছে সবার গমন করা উচিত, অন্য সবাইকে পরিহার করে তাকেই মান্য করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপায় এই ফিতনার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং এই বড় বড় বিশৃঙ্খলা নির্বাপিত থেকেছে, যার ভয়াবহতা হতো খুব জঘন্য, যার পরিণতি হতো মারাত্মক ভয়াবহ। এটা ছিলো বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অনেক বড় অনুগ্রহ, অনন্য কৃপা, ভালোবাসার উপহার। এতো কিছুর পরও এমন লোকদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেই যাচ্ছে, যারা নিজেদেরকে মুজতাহিদ দাবি করে, ইলমি বিষয়ে এই মহান ইমামগণের কারও তাকলিদ না করে নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত মন্তব্য দিব্যি ছুড়ে দেয়। দাবিকৃত বিষয়ে সত্যতা ও যোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ার সুবাদে এই দাবিকারীদের কারও জন্য পথ মসৃণ হয়েছে। আর কারও দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, নিজেদের দাবিতে তারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়েছে। এই স্তরে পৌঁছেনি এমন প্রত্যেকের জন্য সেই ইমামগণের অনুসরণ করা অপরিহার্য। গোটা উম্মাহ্ যে পথে অনুপ্রবেশ করেছে, তাদেরকেও সে পথই গ্রহণ করতে হবে।

কিছু আপত্তি এবং খণ্ডন

আপত্তি-১: কোনো ভনিতাকারী নির্বোধ যদি বলে, কীভাবে সব মানুষকে নির্দিষ্ট কজন ইমামের অনুসরণের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হবে? কীভাবে সবাইকে ইজতিহাদ করতে বারণ করা হবে কিংবা কীভাবে সেই নির্দিষ্ট কজন ইমামের বাইরে অন্য কাউকে অনুসরণ করতে নিষেধ করা হবে?

খণ্ডন: তাকে বলা হবে— সব দেশের সব মানুষ এক হারফে কুরআন পড়বে, এ সিদ্ধান্তের ওপর যেমন সাহাবিগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, এটা ঠিক তেমনই বিষয়। যেহেতু তাঁরা এর মাঝেই কল্যাণকামিতা দেখেছেন, তাই সব মানুষকে যদি বিভিন্ন হারফে কুরআন পড়ার অবকাশ দেয়া হয়, তবে তারা ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক ফিতনায় পতিত হবে। তেমনই আহকামের মাসায়িল এবং হালাল হারামের ফাত্ওয়া— যদি তাতে নির্দিষ্ট কজন ইমামের বক্তব্য সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষণ করা না হতো, তবে পরিণতিতে তা দ্বীনকেই বরবাদ করে ফেলতো। আর প্রত্যেক অথর্ব নির্বোধ নিজেকে মহান মুজতাহিদগণের সারিতে অন্তর্ভুক্ত করে প্রভাব-প্রতিপত্তির আসনে অধিষ্ঠিত হতে চাইতো, নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা উদ্ভাবন করে পূর্ববর্তী কোনো ইমামের দিকে তা সম্পৃক্তকরে দিতো; কখনো তাঁদের বক্তব্যকে নিজের মতো করে বিকৃত করে তাঁদের নামে চালিয়ে দিতো, আর কখনো সেই বক্তব্য হতো পূর্ববর্তী কারও এমন কোনো বিচ্যুতি বা একান্ত নিজস্ব মত যা পরিহার করার ব্যাপারে গোটা উম্মাহ্ একমত হয়েছে। সুতরাং কল্যাণকামিতার দাবি সেটাই, যা আল্লাহ্ ﷻ নির্ধারণ করেছেন এবং ফায়সালা করেছেন— গোটা উম্মাহ্কে এই প্রসিদ্ধ কজন ইমামের মাযহাবের ওপর ঐক্যবদ্ধ করেছেন।

আপত্তি-২ : যদি এই বলে আপত্তি করা হয় যে, কুরআনের সাত হারফের এক হারফ পড়ার ব্যাপারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা আর চার ফকিহ্র কথা মান্য করার ব্যাপারে সবাইকে বাধ্য করা— এ দুটো এক বিষয় নয়। কারণ ওই সাত হারফের ব্যাপারে বলা হয় যে, তার সবগুলোর অর্থ একই বা কাছাকাছি। কোনো এক হারফে পড়লেই সেই অর্থ আদায় হয়ে যায়। চার ফকিহ্র বক্তব্য তো এমন নয়। কেননা এটাও তো সম্ভব যে, তাঁরা সবাই কোনো এক মতের ওপর একমত হয়েছেন, অথচ হক তাঁদের গৃহীত মত থেকে ভিন্ন কিছু।

খণ্ডন: তাহলে এর উত্তরে বলা হবে, অনেক আলিম তো এই আপত্তিকেই গ্রহণ করবেন না। তারা বলবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ﷻ গোটা উম্মাহ্কে কোনো ভ্রান্তির ওপর একত্র করবেন না।[১৭] এ ব্যাপারে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যা এই অভিমতকে শক্তিশালী করে। যদি আপত্তি মেনেও নেয়া হয়, তবুও এমন হওয়াটা তো খুবই বিরল। আর সেই ভ্রান্তিকে চিহ্নিত করা তো এমন মুজতাহিদের পক্ষেই সম্ভব, যার ইলমি অবস্থান তাদের অবস্থান থেকেও উর্ধ্বে। এটা তো দুষ্প্রাপ্য কিংবা খুবই বিরল। আর যদি এমন মুজতাহিদের অস্তিত্ব কল্পনাও করা হয়, তবে তার ওপর ফরজ হলো সেই বিষয়ের অনুসরণ করা, যা তার কাছে হক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। আর অন্যদের ওপর ফরজ হলো, মুজতাহিদের তাকলিদ করা। আর নিঃসন্দেহে এই ইমামগণের অনুসরণ যথার্থ। এজন্য তাঁদের ওপর কোনো গুনাহ আপতিত হবে না; তাঁর সব অনুসারী কিবা কতেক অনুসারীর ওপরও নয়।

আপত্তি-৩: যদি আপত্তি করা হয়— তবে তো এর ফলাফল হচ্ছে, ভুল-বিচ্যুতির ক্ষেত্রেও ইমামগণের অনুসরণ করা হবে।

খণ্ডন: তাকে বলা হবে, সব মানুষ ঠিক বলবে এটা তো হয় না। বিপরীত পক্ষের কারও না কারও তো এই দোষে নিন্দিত হতেই হবে। তাহলে গোটা উম্মাহ্ ভুলে আক্রান্ত হচ্ছে না। আর যদি এমন হয়ও তবে তার অধিকাংশই এমন ক্ষেত্রে, যা খুব কমই সংঘটিত হয়। ব্যাপকভাবে মুসলমানরা প্রতিনিয়ত যে বিষয়গুলোর মুখোমুখি হয়, সেক্ষেত্রে এই বিশ্বাস ধারণ করা সম্ভব নয় যে, এই সুদীর্ঘকাল ধরে ইমামগণ সবাই ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। কেননা, এটা তো উম্মাহ্র ব্যাপারেই একটি ত্রুটি ও দোষের বিষয়, যা থেকে আল্লাহ্ ﷻ এই উম্মাহ্কে পানাহ দিয়েছেন।

---

[১৭] عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ

ইবনু উমার رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আমার উম্মাহ্কে (অথবা বলেছেন, মুহাম্মাদ ﷺ-র উম্মাহ্কে) কোনো গোমরাহির ওপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আল্লাহ্র সাহায্য জামাআতের সাথে। যে বিচ্ছিন্ন হয়, সে জাহান্নাম অভিমুখে বিচ্ছিন্ন হয়।'
(জামি তিরমিযি: ২১৬৭)

আপত্তি-৪: যদি বলা হয়— এটা নয়তো আমরা মেনে নিলাম, জনসাধারণকে ইজতিহাদের পথ অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখা হবে, যেহেতু তা অনেক বিশৃঙ্খলার কারণ হবে; কিন্তু এটা তো মেনে নিতে পারি না যে, প্রসিদ্ধ এই চার ইমাম ছাড়া অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্য থেকে অনুসৃত কোনো ইমামের তাকলিদ করাও নিষিদ্ধ হবে।
খণ্ডন: তাকে বলা হবে, আমরা এই নিষিদ্ধতার কারণ আগেই বলেছি যে, এই প্রসিদ্ধ চার ইমাম ছাড়া অন্যান্য ইমামগণের মাযহাব সম্পূর্ণভাবে সংকলিত হয়নি, যথাযোগ্য প্রসিদ্ধিও লাভ করেনি। এজন্য অনেক সময়ই তাদের দিকে এমন সব কথার নিসবত করা হয়েছে যা তাঁরা বলেননি এবং তাঁদের বক্তব্য থেকে এমন অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, যা তাঁরা উদ্দেশ্য নেননি। তাঁদের মাযহাবসমূহে এমন ব্যক্তিত্বও নেই, যিনি মাযহাবের প্রতিরোধ করবেন, মাযহাবে যেসব ত্রুটি ঢুকে পড়েছে তার ব্যাপারে সতর্ক করবেন। প্রসিদ্ধ চার মাযহাব তো এর ব্যতিক্রম।

আপত্তি-৫: যদি বলা হয়— এই মাযহাবগুলোর মতো সংকলিত ও সুসংরক্ষিত রয়েছে এমন মাযহাবের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?
খণ্ডন: প্রথমত বলা হবে, বর্তমানে এর কোনো অস্তিত্ব আছে বলে জানা যায় না। যদি বর্তমানে তার কোনো খোঁজ পাওয়াও যায় এবং এর অনুসরণ ও এই মাযহাবের দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করার বৈধতা মেনেও নেয়া হয়, তবে তা তো স্রেফ এমন ব্যক্তির জন্যই জায়িয হবে, যে ব্যক্তি সেই মাযহাবের দিকে প্রকাশ্যে নিজেকে নিসবত করে, তার আলোকে ফাত্ওয়া দেয় এবং তার প্রতিরোধ করে। যে নিজেকে প্রকাশ্যে প্রসিদ্ধ ইমামগণের কোনো একজনের মাযহাবের দিকে নিসবত করে আর গোপনে অন্য কারও দিকে সম্পৃক্ত, অন্য কোনো অপ্রসিদ্ধ ইমামের মাযহাবের অনুসারী— কোনো অবস্থায়ই তার জন্য এর সুযোগ নেই। এটা নিফাক ও তাকিয়ার[১৮] অন্তর্ভুক্ত। বিশেষত যে ব্যক্তি ওই অপ্রসিদ্ধ ইমামগণের অনুসারীদের সাথে তাদের জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদ বা অন্য কোনো

[১৮] তাকিয়া হলো শিয়া ধর্মাবলম্বীদের একটি আকিদাহ্। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ ﷺ এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'শিয়ারা বলে—আমাদের ধর্ম হল 'তাকিয়া'!! আর তাকিয়া হলো— তাদের কোনো ব্যক্তির মনের মাঝে যা আছে, তার মুখের ভাষায় এর বিপরীত কথা বলা। বস্তুত এটা হলো নিরেট মিথ্যা ও কপটতা (নিফাক)।'

(মিনহাজুস সুন্নাহ্— ১:৬৮)

বিশেষ সুবিধা ভোগ করে অথবা যে মানুষের চোখে হাকিকাত অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত করে ফেলে, তার জন্য তো এর জঘন্যতা আরও বেশি। এভাবে মানুষের চোখে ধোঁকা দেয়— গোপনে সে যে ইমামের দিকে সম্পৃক্ত, সে মাযহাবের আলোকে এমনভাবে ফাত্ওয়া দেয় যে, সবাই ভাবে, এটা বুঝি সেই প্রসিদ্ধ ইমামের মাযহাব, বাহ্যত যার দিকে সে নিজেকে নিসবত করে। এটা কোনোভাবেই বৈধ নয়। তার এই কাজ উম্মাহ্র সাথে ধোঁকাবাজি এবং উম্মাহ্র ইমামগণের ওপর মিথ্যারোপ। যে-কেউ ইসলামের ইমামগণের দিকে এমন কথা সম্পৃক্ত করে, যা তাঁরা বলেননি অথবা যে ব্যাপারে জানা যায় যে, তারা এর বিপরীতটা বলেছেন— তাহলে নিশ্চয়ই সে মিথ্যাবাদী, শাস্তির উপযুক্ত। ঠিক একইরকম ব্যাপার হচ্ছে— নির্দিষ্ট কোনো ইমামের মাযহাবের ওপর কোনো কিতাব লেখে আর গোপনে সে যে ইমামের মাযহাবের দিকে সম্পৃক্ত, সে ইমামের নাম না বলেই তাতে তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করে। তেমনিভাবে রচিত কিতাব যদি নির্দিষ্ট মাযহাবের সাথে বিশিষ্ট না হয়, কিন্তু রচয়িতা নির্দিষ্ট কোনো এক ইমামের মাযহাব প্রকাশ্যে এবং অন্য কোনো মাযহাবের সাথে গোপনে সম্পৃক্ত থাকে আর তার কিতাবে প্রকাশ্যে নিসবতকৃত ইমামের মাযহাব-বিরোধী মত উল্লেখ করা ছাড়াই গোপনে অনুসরণ করা ইমামের অভিমত উল্লেখ করে— তবে এ সবই ভ্রান্তি ও ধোঁকা, যা সম্পূর্ণ অবৈধ।

এর কারণে ইমামগণের মাযহাব মিশ্রিত হয়ে যায় এবং মাযহাবের কাঠামো নড়ে যায়। এর সাথে সে যদি আবার ইজতিহাদের দাবিদার হয়, তাহলে তো অবস্থা আরও মারাত্মক ও ভয়াবহ, বড় বিশৃঙ্খলার এবং অধিক বিদ্বেষের। কেননা যে ব্যক্তির মাঝে ইজতিহাদের সব যোগ্যতা— কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান, সাহাবা-তাবিয়িনের ফাত্ওয়ার জ্ঞান, ইজমা ও ইখতিলাফের জ্ঞান, ইজতিহাদের অন্যান্য বিধিত শর্তাবলি— পূর্ণরূপে বিদ্যমান নেই, তার জন্য ইজতিহাদ করার কোনো অবকাশই নেই। ইজতিহাদের জন্য সুন্নাহ্র ব্যাপারে ব্যাপক জানাশোনা প্রয়োজন, যয়িফ থেকে পৃথক করে সহিহ্ হাদিস চিনতে পারা, সাহাবা-তাবিয়িনের মাযহাব এবং এসব ক্ষেত্রে তাদের থেকে বর্ণিত আসারের ব্যাপারে যথেষ্ট জানাশোনা প্রয়োজন। এজন্যই ইমাম আহমাদ ﷺ ফাত্ওয়ার বিষয়টাকে খুব বড় করে দেখতেন। এক-দুলক্ষ হাদিস জানে, এমন মানুষদেরকেও ফাত্ওয়া দিতে নিষেধ করতেন। সেই ব্যক্তির মুজতাহিদ হওয়ার দাবির বিশুদ্ধতার আলামত হলো, সব মাসয়ালায় সে অন্যান্য ইমামের মতো স্বতন্ত্রভাবে ফাত্ওয়া দেবে। তার বক্তব্য-অভিমত অন্য কারও কথা থেকে ধার করা হবে না। যে শুধু

অন্য ইমামগণের বক্তব্য নকল করার ওপরই নির্ভর করে, হুকুম বা হুকুম ও দলিল উভয়ের ক্ষেত্রেই তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা হয় কেবল সেই বক্তব্যগুলো যথাযথ বোঝার চেষ্টা করা— অনেক সময় তো ভালো করে বুঝতেও সক্ষম হয় না কিংবা পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন করে ফেলে— তাহলে ইজতিহাদের স্তর থেকে এ যে কতো দূরের বিষয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে! যেমন বলা হয়েছে—

فدع عنك الكتابة لست منها ... ولو سوّدت وجهك بالمداد

'লেখার প্রচেষ্টা ছেড়ে দাও তুমি। তোমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না; যদিও কালি দিয়ে নিজের চেহারাই কালো করে ফেলো।'

আপত্তি-৬: যদি বলা হয়, ইমাম আহমাদ বা অন্যান্যদের থেকে যে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা তাঁদের তাকলিদ করতে এবং তাঁদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, আমার কথা বা অমুক অমুকের কথা লিখো না। আমরা যেমন শিখেছি তুমিও তেমনি শেখো। ইমামগণের কথায় এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

খণ্ডন: তাকে বলা হবে, নিঃসন্দেহে ইমাম আহমাদ ﵀ ফকিহগণের মত-অভিমতের ব্যাপারে বাধা-নিষেধ আরোপ করতেন। দিনমান এসব নিয়ে পড়ে থাকতে, এসব মুখস্থ করে আর লিখে লিখে খাতা ভারি করে রাতদিন কাটিয়ে দিতে বারণ করতেন। কিতাব ও সুন্নাহ্র চর্চায় ব্যস্ত থাকতে তিনি নির্দেশ দিতেন— ব্যস্ততা হিসেবে নুসুস মুখস্থ করা ও বোঝা, লিপিবদ্ধ করা ও অধ্যয়ন করার কাজকে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিতেন। পরবর্তীদের এই-সেই মত-অভিমত বাদ দিয়ে সাহাবা-তাবিয়িনের আসার লিপিবদ্ধ করতে বলতেন তিনি। পাশাপাশি তিনি বর্ণনার ত্রুটি-দুর্বলতা থেকে আলাদা করে এর বিশুদ্ধতা নিরূপণ করতে পারার জ্ঞান-বিদ্যা অর্জন এবং সেসবের বর্জনীয়গুলো থেকে আলাদা করে গ্রহণীয়গুলো চেনার যোগ্যতা তৈরি করতে গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিতেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, সবার আগে এ বিষয়ের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং অন্য সবকিছুর আগে এ ব্যস্ততায় রত হওয়াটাই নিয়ম-রীতি। এই জ্ঞান যার অর্জিত হবে এবং এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছবে— যেমনটা ইমাম আহমাদের বক্তব্য থেকে অনুমিত হয়— তাহলে তো তার ইলম ইমাম আহমাদের ইলমের কাছাকাছি হয়ে যাবে। তার ওপর তো কোনো বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়নি; সে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মাঝেই পড়ে না। কথা তো তাকে নিয়ে, যে এই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেনি এবং এই চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়নি। আর এসব জ্ঞান-

বিজ্ঞানের সিকিভাগই তার বোধে ধরে। যেমনটা এই যুগের মানুষদের অবস্থা, বরং যুগযুগ ধরে জনমানুষের অবস্থা এই-ই। যদিও তাদের অনেকেই এই দাবি করে যে, সে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং একেবারে চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়েছে। অথচ তাদের অধিকাংশই প্রাথমিক স্তরটাও পাড়ি দেয়নি। পাঠক, বিষয়টা যদি যথার্থভাবে জানতে চাও এবং তার বিশ্লেষণ করতে চাও, তাহলে কিতাব ও সুন্নাহ্র ব্যাপারে ইমাম আহমাদের ইলমের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করো।

ইমাম আহমাদের ইলমি অবস্থান

কিতাবুল্লাহ্‌র ব্যাপারে তাঁর ইলম

তিনি কুরআন ও কুরআনের বক্তব্য অনুধাবন এবং এর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে ভর্ৎসনা করে বলতেন— মানুষ তো আজকাল কুরআন বোঝা ছেড়েই দিয়েছে। তিনি কুরআনের খিদমাতে অনেক গ্রন্থ রচনা-সংকলন করেছেন। এর মাঝে সবিশেষ উল্লেখ্য—'আননাসিখ ওয়াল মানসুখ', 'আলমুকাদ্দাম ওয়াল মুয়াখখার'। তিনি 'আততাফসিরুল কাবির' নামক সুবিশাল তাফসিরগ্রন্থও রচনা করেছেন। এ অসামান্য গ্রন্থটি ছিলো সাহাবা তাবিয়িনের অভিমতে ভরপুর। তাঁর তাফসির গ্রন্থের ধারা ছিলো সালাফের তাফসির গ্রন্থাদির মতো; যেমন তাঁর শাইখগণের তাফসির— ইমাম আব্দুর রাযযাক, ওয়াকি, আদাম ইবনু আবি ইয়াস এবং অন্যান্যদের। তেমনি তাঁর সমসাময়িকদের তাফসিরের ধারাও ছিলো তেমনই; যেমন ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াহ্ ও অন্যান্যরা এবং তাঁর পরবর্তী যারা এই ধারা অনুসরণ করেছেন তাঁদের রচিত তাফসির গ্রন্থাদিও ছিলো একই ধরনের; যেমন নাসায়ি, ইবনু মাজাহ, আব্দ ইবনু হুমাইদ, ইবনু আবি হাতিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ। তাঁরা সবাই-ই তাফসিরের ক্ষেত্রে সালাফ থেকে বর্ণিত আসার উদ্ধৃত করেছেন, নিজেদের পক্ষ থেকে বক্তব্য সংযোজন করেননি।

সুন্নাহ্‌র ব্যাপারে তাঁর ইলম

এ তো সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্বজনবিদিত বিষয়। এ ব্যাপারে সকলের ইজমা রয়েছে। তিনি ছিলেন হাদিস-সুন্নাহ্‌র ঝান্ডাধারী; তাঁর সময়ে রাসুলের হাদিস এবং সাহাবা-তাবিয়িনের বক্তব্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সবচে বেশি অবগত।

ইমাম আহমাদের অসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য

ইমাম আহমাদ ﵀ তাঁর সমসাময়িকদের চেয়ে অসংখ্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। যেমন—মুখস্থশক্তির ব্যাপকতা ও অধিকতা বর্ণিত আছে, তাঁর তিন লক্ষ হাদিস মুখস্থ ছিলো। আরেকটি বৈশিষ্ট্য, হাদিসের সহিহ্-যয়িফের জ্ঞান; এটা কখনো সমালোচিত বর্ণনাকারীদের থেকে বিশ্বস্তদেরকে জানার মাধ্যমে— জারহ-তাদিল শাস্ত্রে সবার চূড়ান্ত নির্ভরতার পাত্র তো তিনিই— আর কখনো হাদিসের সবগুলো সূত্র এবং সেগুলোর পারস্পরিক ভিন্নতা জানার মাধ্যমে। এটাকেই পরিভাষায় ইলালুল হাদিসের জ্ঞান বলা হয়। এক্ষেত্রেও তিনিই সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত।

এ বিষয়ে ইমাম আহমাদের মতো আরও অনেক হাফিজুল হাদিসই মারফু হাদিসের ইল্লত জানার ক্ষেত্রে তাঁর মতোই পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু মাওকুফ হাদিসের ইল্লত জানার ক্ষেত্রে তাঁর স্তরে দ্বিতীয় কেউ পা রাখতে পারেনি। এ শাস্ত্রে তাঁর মতামতগুলো নিয়ে যে ভাববে, সে চরম বিস্ময় দেখতে পাবে এবং দৃঢ়তার সাথে বলতে বাধ্য হবে, এই শাস্ত্রে খুব স্বল্প সংখ্যক বোদ্ধাই তাঁর বোধ-উপলব্ধির স্তরে উপনীত হতে পারে। আরেকটি বৈশিষ্ট্য— হাদিসের ফিকহ জানা ও বোঝা; হালাল হারামের বিধান এবং নুসুসের অর্থ ও মর্ম যথাযথভাবে অবগত হওয়া। তাঁর সমসাময়িকদের মাঝে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন সবেচে বেশি জ্ঞানী। তাঁর সমসাময়িক ইমামগণ এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন ইমাম ইসহাক, ইমাম আবু উবাইদ এবং অন্যান্যরা। ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর মতামত-পর্যালোচনা নিয়ে যে ভাববে, এক্ষেত্রে তার উৎস ও সূত্র বুঝবে, সে মহান ইমামের উপলব্ধি এবং উদঘাটনশক্তির প্রখরতা অনুধাবন করতে পারবে। তাঁর বক্তব্যের সূক্ষ্মতার কারণে অনেক সময় তাঁর মাযহাবের অনেক গ্রন্থকারের পক্ষেও তা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা মাসয়ালার ক্ষেত্রে তাঁর সূক্ষ্ম উৎসগুলো থেকে সরে অন্য মাযহাব থেকে দুর্বল কোনো উৎস গ্রহণ করে সেগুলোকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন। এর কারণে তাঁর অভিমত অনুধাবন করতে গিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে এবং সেগুলোকে অপাত্রে প্রয়োগ করা হয়ে যায়। ইমাম আহমাদের বক্তব্য বোঝা, অনুধাবন করা হাম্বলি মাযহাবের তালিবুল ইলমদের জন্য একান্ত

অপরিহার্য। ইমাম আহমাদ থেকে এমন ইলম ও উপলব্ধিশক্তি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা প্রবল বিস্ময় জাগায়। আর কেনোই বা বিস্ময় জাগবে না, অথচ যেকোনো মাসয়ালার ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তী সবার— সাহাবা তাবিয়িন এবং তাঁদের পরবর্তীদের— যতো মত-অভিমত রয়েছে, সবই তাঁর জানা ছিলো। তাঁর ইলম এ সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করেছিলো। তিনি প্রতিটি মাসয়ালার উৎস বুঝেছেন, এর ফিকহ অনুধাবন করেছেন। তেমনি সকল ফকিহ্ ও ইমামগণের বক্তব্য-অভিমতও তাঁর জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিলো। যেমন ইমাম মালিক, আওযায়ি, সাওরি রহিমাহুমুল্লাহ্ এবং বাকি অন্যান্যদের বক্তব্য-অভিমত। তাঁর সামনে এ সকল ইমামের ইলম ও ফাত্ওয়া উপস্থাপন করা হয়েছিলো, তিনি কোনোটাকে সমর্থন করে আর কোনোটাকে খণ্ডন করে একে একে সবগুলোর উত্তর দিয়েছেন। মুহান্না ইবনু ইয়াহয়িয়া শামি তাঁর সামনে আওযায়ি ﷺ এবং তাঁর শাগরেদদের প্রায় সব মাসয়ালা উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি সবগুলোরই উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। এক জামায়াত তাঁর সামনে মুয়াত্তা ও অন্যান্য কিতাব থেকে ইমাম মালিকের মাসায়িল এবং ফাত্ওয়া পেশ করেছিলেন। তিনি সেগুলোরও উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সূত্রে হাম্বল ও আরও অনেকে তা বর্ণনা করেছেন। ইসহাক ইবনু মানসুর তাঁর সামনে সাওরি ﷺ-র প্রায় সব মাসয়ালা উপস্থাপন করেছিল। তিনি সেগুলোরও উত্তর দিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম আহমাদ প্রথমে ইমাম আবু হানিফা ﷺ-র কিতাবসমূহ লিখে লিখে বুঝতেন, ফিকহে তাঁদের উৎস-সূত্র অনুধাবন করতেন। দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত তিনি ইমাম শাফিয়ির সান্নিধ্যে থেকেছেন, তাঁর সাথে ইলমি আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। ইমাম আহমাদ তখন সবেমাত্র যৌবনে, প্রৌঢ়ও হননি, তখনই ইমাম শাফিয়ি ﷺ ফিকহ ও ইলমের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপারে সেই সুমহান স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর এটা তো সুবিদিত বিষয়— এসব ইলমের যথাযোগ্য উপলব্ধি-বুঝ যার আছে এবং তাতে ব্যুৎপত্তিও অর্জন করেছে, তার কাছে নব-উত্থাপিত বিষয়সমূহ জানা এবং সুবিন্যস্ত উসুল ও বিদিত উৎসের আলোকে সমাধান দেয়া খুব সহজ। এজন্যই তাঁর সম্পর্কে আবু সাওর ﷺ বলেছেন— ইমাম আহমাদকে কোনো মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মনে হতো, যেনো দুনিয়ার সব ইলম তাঁর দুচোখের মাঝে ফলকের মতো এঁটে দেয়া আছে। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্রমাণিত যতো সুন্নাহ্র জ্ঞান আমাদের রয়েছে, ইমাম আহমাদের জ্ঞান তার পুরোটাই পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। কোনো সুন্নাহ্ সহিহ্

প্রমাণিত হলে এবং এর সাথে সাংঘর্ষিক এমন মজবুত কোনো কারণ না থাকলে, তা অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে কঠোর। তিনি সেসব সুন্নাহ্‌কেই পরিত্যাগ করেছেন, যা সহিহ্ সূত্রে প্রমাণিত নয় কিংবা যার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো মজবুত কারণ রয়েছে।

আমালের ক্ষেত্রে সালাফের রীতি

সালাফগণ নবুওয়াতের সময়ের নিকটবর্তী হবার কারণে এবং সাহাবা তাবিয়িন ও তাঁদের পরবর্তী যারা তাদের মতামত-জীবনাচার সম্পর্কে অধিক জানাশোনা থাকার কারণে আমল হয় না এমন সব শায[১১] হাদিসগুলো চিনে ফেলতেন এবং সেগুলোকে পরিত্যাগ করতেন। সালাফ যে রীতির ওপর চলে জীবন পার করেছেন, তার ওপর আমল করাকেই তারা যথেষ্ট মনে করতেন। এক্ষেত্রে পরবর্তীরা জানতে পারেনি এমন সব বিষয়েও তাঁর জ্ঞান ছিলো। নবুওয়াতের সময় থেকে অনেক দূর ও পরে হবার কারণে পরবর্তীদের কাছে সুন্নাহ্র জ্ঞান পৌঁছেছে একমাত্র হাদিসের কিতাবাদির মাধ্যমে।

---

[১১] বিচ্ছিন্ন

তালিবুল ইলমের প্রতি নাসিহাহ্

এ বিষয়টা যখন যথাযথভাবে তুমি জানলে এবং বুঝলে, তখন হে তালিবুল ইলম, কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমার প্রতি কয়েকটি নাসিহাহ্ পেশ করছি। কেননা, তোমাদের কেউ ততোক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।[২০] খবরদার, ভুলেও এ কথা ভেবে বসো না যে, তুমি এমন সব বিষয় জেনে ফেলেছো, যা এই মহান ইমাম জানেননি; বোধ-উপলব্ধির এমন স্তরে উপনীত হয়েছো, যেখানে এই মহান ইমাম পৌঁছতে পারেননি। তিনি তো সেই ব্যক্তি, পরবর্তী জ্ঞানী-বোদ্ধাদের ওপর যার বোধ-উপলব্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্ট। যেসব বিষয়ে তিনি ইঙ্গিত করেছেন এবং কুরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানার্জনে যে নির্দেশনা তিনি দিয়ে গেছেন— যার ব্যাখ্যা আগেই করা হয়েছে— তোমার পুরো মনোযোগ যেনো সেসব বিষয় বোঝার ওপর নিবদ্ধ থাকে। এরপর শুধুই হালাল হারামের মাসয়ালায় নয়, সকল ইলমি মাসয়ালায় এই ইমামের বক্তব্য-মতামত বোঝার ওপর যেনো তোমার লক্ষ্য-ভাবনা নিবদ্ধ হয়। যেমন ইলমুল আফাক— আল্লাহ্ ﷻ, মালাইকা, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ এবং শেষ দিবস ইত্যাদির ইলম। অধিকাংশ আলিমের পরিভাষায় এই ইলমের নাম ইলমুস সুন্নাহ্। কেননা ইমাম আহমাদ এই ইলমের ক্ষেত্রে ছিলেন সর্বোচ্চ শিখরে।

ইলমুস সুন্নাহ্র কিছু মাসয়ালার কারণে তাঁকে অনেক পরীক্ষারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। আল্লাহ্র জন্য তিনি সেসব পরীক্ষায় সবর করেছেন। মুসলিমরাও তাঁর মতামত— যা তিনি বলে গেছেন— এবং তার মাকাম— যেখানে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন— এর যথার্থতার ব্যাপারে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকৃতি দিয়েছে। তারা সাক্ষ্য দিয়েছে, ইমাম আহমাদ ইমামুস সুন্নাহ্; আর তিনি যদি না হতেন, তবে সব মানুষ কাফির হয়ে যেতো। ইলমুস সুন্নাহ্য় যার অবস্থান এই, তো কীভাবে একজন তালিবুল ইলম এই ইলমকে তিনি ছাড়া অন্য কারও থেকে গ্রহণ করার

---

[২০] আনাস ﷺ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি (হাদিস— ১৩) এবং ইমাম মুসলিম (হাদিস— ৪৫)

প্রতি অভিমুখী হবে; বিশেষত সে, যে তাঁরই মাযহাবের দিকে নিজেকে নিসবত করে?! তাঁর উচিত এই ইলমের প্রায় সব অধ্যায়ে ইমাম আহমাদের বক্তব্য-অভিমতকেই গ্রহণ করা আর নতুন-উত্থাপিত অনর্থক সব মাসায়িল থেকে নিজেকে বিমুখ রাখা। মুসলমানদের নতুন-উত্থাপিত জিনিসের মাঝে কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। বরং এসব বিষয় মানুষকে উপকারী ইলম থেকে সরিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত করে, মুসলমানদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং অপরিহার্যভাবে পৃথিবীতে ঝগড়া-ফাসাদের অবতারণা করে; যার ব্যাপারে আগেকার মহান সালাফগণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে গেছেন। তেমনিভাবে ইলমুল ইহসান— আল্লাহ্‌র ভয় এবং তাঁর মুরাকাবার ইলম। এক্ষেত্রেও ইমাম আহমাদের অবস্থান ছিলো সুউচ্চে, যেমনিভাবে হালাল-হারামের বিধান এবং ইলমুল ইমানে তিনি ছিলেন অনুপম এক নিদর্শন। তবে এই ইলমে হাল চমকপ্রদ করার পরিবর্তে আমল যথাযথ করাই তাঁর ওপর প্রবল ছিলো। এজন্য তিনি সালাফ থেকে বর্ণিত রীতিই প্রয়োগ করতেন; তা নয়, যা পরবর্তীরা খালাফ থেকে নিয়েছে। তিনি তাঁর সব ইলমে সুন্নাহ্‌র ওপর নির্ভর করতেন।

সালাফ যে ধরনের বক্তব্য প্রয়োগ করেননি, সে ধরনের বক্তব্য প্রয়োগ করাকে তিনি বৈধতার চোখে দেখতেন না; বিশেষত ইলমুল ইমান[২১] ও ইলমুল ইহসানে[২২]। আর ইলমুল ইসলামে[২৩] তিনি নতুন-উত্থাপিত বিষয়সমূহের উত্তর দিতেন, যেহেতু এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি তার সঙ্গীদেরকে নিজেদের থেকে এমন বিষয়ে কথা বলতে বারণ করতেন, যেক্ষেত্রে তাদের কোনো সালাফ-ইমাম নেই। সাধারণত তিনি সেসব প্রশ্নেরই উত্তর দিতেন, যার ব্যাপারে আগেই কথা হয়ে গেছে। এমন সব বিষয়েই তিনি কথা বলতেন, যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং যা বাস্তবে অবশ্যই সংঘটিত হবে আর তার হুকুমও জানা দরকার। ফকিহ্‌রা যেসব নিত্য-নতুন মাসয়ালার জন্ম দিয়েছে— যা মোটেও সংঘটিত হয় না কিংবা হলেও খুব বিরল— তিনি সেগুলোর ব্যাপারে কথা বলতে অনেক নিষেধ করতেন। কেননা এর ফায়দা খুব সীমিত; উপরন্তু এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে ব্যস্ততাকে তা ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়। তিনি বেশি বিতর্ক-বিবাদকে ইতিবাচক চোখে দেখতেন না। কোনো ইলম,

---

[২১] ইলমুল আকায়িদ; অপর ভাষায় ইলমুস সুন্নাহ্‌ বা ইলমুল আফাক

[২২] অন্য ভাষায় তাযকিয়াহ্‌

[২৩] হালাল হারামের বিধানের ক্ষেত্রে

মারিফাত ও হালের ক্ষেত্রে কিলা-কালা[২৫] এর অবকাশ আছে বলে মনে করতেন না। এসব ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ ও আসারকেই যথেষ্ট মনে করতেন। বক্তব্য অযথা দীর্ঘ না করে, অতিরিক্ত কথা না বলে তার মর্ম অনুধাবন করার প্রতি উৎসাহ দিতেন। আল্লাহ্‌র শোকর, তিনি অক্ষমতা কিংবা মূর্খতার কারণে অযাচিত দীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করা থেকে বিরত থাকেননি। সতর্কতার খাতিরে, একে অনর্থক মনে করে এবং রাসুলের সুন্নাহ্‌কে যথেষ্ট মনে করার কারণেই তিনি তা করেছেন; রাসুলের সুন্নাহ্‌র মাঝেই যথেষ্টতা রয়েছে। আসসালাফুস সালিহ্ তথা সাহাবা তাবিয়িনের অনুসরণেই তিনি তা করেছেন। আর তাঁদেরকে অনুসরণ করার মাধ্যমেই তো হিদায়াত অর্জিত হবে। তুমি যদি এই নসিহাহ্ গ্রহণ করো, সহিহ্ তরিকা অবলম্বন করো, তাহলে তোমার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা যেনো হয়— প্রথমে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র শব্দাবলি হিফজ করা, এরপর উম্মাহ্‌র সালাফ এবং ইমামগণ যা বলেছেন তার আলোকে এর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়া, এরপর সাহাবা তাবিয়িনের বাণী, তাঁদের ফাত্‌ওয়া এবং মহান ইমামগণের বক্তব্য-অভিমত আত্মস্থ করা; ইমাম আহমাদের বক্তব্য-অভিমত জানা আর তা শব্দ ও মর্মসহ আত্মস্থ করা এবং তার উপলব্ধি ও অনুধাবন করার জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করা।

যখন তুমি এই স্তরে পৌঁছে যাবে, তখন তুমি মনে মনে ভেবে বসো না যে, তুমি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছো। তুমি তো অসংখ্য বিদ্যান্বেষী তালিবুল ইলমের মাঝে একজন সাধারণ তালিবুল ইলম মাত্র। যা জেনেছো, এতোকিছু জানার পরও যদি তুমি ইমাম আহমাদের যামানায় হতে, তাহলে তালিবুল ইলমদের কাফিলার মাঝেও তুমি সাধারণ কেউ হিসেবেও গণ্য হতে না। এখন যদি তোমার মন এ কথা ভাবে যে, তুমি মহান সালাফের স্তরে উপনীত হয়ে গেছো, তাহলে কতো মন্দ ধারণাই না তুমি করলে! খবরদার! যে ইলমগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হলো, সেগুলো হিফজ করা থেকে এবং যে নস ও আসারগুলোর দিকে হাওয়ালা করা হলো সেসব আত্মস্থ করা থেকে নিজেকে বিরত রেখে বেশি বেশি তর্ক-বিবাদ এবং বেশি পরিমাণে কিলা-কালায় লিপ্ত হয়ে নিজেকে তুমি ধ্বংস করো না। তখন তুমি নিজের বিবেকের কাছে যা সুন্দর মনে হয় তার আলোকে এক মতকে অন্য মতের ওপর প্রাধান্য দিতে শুরু করবে অথচ বাস্তবে তুমি জানবেই না, সেই মতের প্রবক্তা কে! তা কি গ্রহণীয় সালাফের থেকে বর্ণিত মত নাকি ভারসাম্য-বর্জিত কারও মত!

---

[২৫] এমন বলা হয়েছে, তেমন বলা হয়ে থাকে— এ ধরনের কথাবার্তা

লম্বাচওড়া কথা বলেননি। এখন এর দ্বারা কি ইসলামের মহান ইমামগণ, যেমন সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব, হাসান, আতা, নাখয়ি, সাওরি, লাইস, আওযায়ি, মালিক, শাফিয়ি, আহমাদ, ইসহাক, আবু উবাইদ এবং অন্যান্যদের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান করা বৈধ হবে?! বরং সাহাবিদের চেয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এমন তাবিয়ির সংখ্যা ঢের গুণ বেশি। এখন কোনো মুসলমান কি এই বিশ্বাস লালন করবে যে, তাবিয়িরা আলিম সাহাবিদের চেয়েও বড় জ্ঞানী, বেশি ইলমওয়ালা?!

নবিজি ﷺ-র কথা একটু ভাবো। তিনি বলছেন—

اَلْإِيْمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ

'ইমান হলো ইয়ামানবাসীদের ইমান এবং হিকমাহ্ হলো ইয়ামানবাসীদের হিকমাহ্।'[২৭]

ইয়ামানবাসীদের প্রশংসায় রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তা বলেছেন। তাদের জন্য ফিকহ ও ইমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেহেতু ফিকহ ইমান ও হিকমাহ্র ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ছিলো সর্বোচ্চ শিখরে, তাই এ বিষয় দুটোকে তাদের দিকে নিসবত করেছেন। সালাফ ও খালাফ আলিমগণের মধ্যে ইয়ামানবাসীদের চেয়ে কম কালামকারী এবং স্বল্প বিবাদকারী কোনো গোষ্ঠীর কথা আমাদের জানা নেই। এটাই তো প্রমাণ বহন করে যে, শরিয়াহ্প্রণেতার ভাষায় প্রশংসনীয় ইলম ও ফিকহ হলো ইলম বিল্লাহ্, যা তাঁর মুহাব্বাহ্র পর্যায়ে পৌঁছায়, তাঁর তাযিমের দিকে নিয়ে যায়। আর ইলম বিল্লাহ্ প্রশংসনীয় হবে তখন, যখন বান্দা তার পাশাপাশি ফরজ ইলমের জ্ঞানও রাখবে, জীবন চলার পথে যার দিকে সে একান্ত মুখাপেক্ষী— অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কিত জ্ঞান। পূর্ববর্তী ইয়ামানবাসী আলিমগণ যেমন আবু মুসা আশয়ারি ﷺ, আবু মুসলিম খাওলানি, উওয়াইস এবং প্রমুখদের অবস্থা এমনই ছিলো। প্রশংসনীয় ইলম ও ফিকহ তা নয়, যা পরবর্তীতে এর সাথে যুক্ত হয়েছে— একজনের অভিমত দিয়ে আরেকজনের অভিমত খণ্ডন করা, তাদের গোপনীয়তা এবং ভুল-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো। বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার করছি। অধিকাংশ ইমাম দু-চার সহজ মাসয়ালায় ভুল করেছেন, যা তাদের ইমামাত ও সমুদ্রসম ইলমের জন্য কোনো ত্রুটি নয়। তো কী হলো? এটা তো বরং তাঁদের মর্যাদা ও সাওয়াবের আধিক্য

---

[২৭] আবু হুরাইরা ﷺ থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

(দেখুন— সহিহ্ বুখারি: ৪৩৮৮, ৪৩৮৯, ৪৩৯; সহিহ্ মুসলিম: ৫২)

এবং তাঁদের যথার্থ লক্ষ্য ও দ্বীনের সাহায্য প্রতিষ্ঠা করছে। তাঁদের ভুল-ত্রুটি খোঁজার কাজে নিজেকে ব্যস্ত করা প্রশংসনীয় বা নন্দিত কোনো বিষয় নয়; বিশেষ করে ছোটোখাটো মাসায়িলে, যাতে ভুল হলেও কোনো ক্ষতি নেই এবং এমন ক্ষেত্রে তাঁদের ভুল উন্মোচিত করা, প্রচার করা কোনো ফায়দাই বয়ে আনে না। তেমনই অনর্থক জ্ঞান— যা দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো উপকার করে না, বরং আল্লাহ্ ﷻ ও তাঁর থেকে ব্যস্ততাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়, তাঁর স্মরণ থেকে অন্তর শক্ত করে দেয় এবং তাতে লিপ্ত ব্যক্তির মাঝে অপরিহার্যভাবে মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে— নিয়ে বেশি আলোচনা-পর্যালোচনা করাতেও ফায়দা নেই। এ সবই প্রশংসনীয় নয়। নবি ﷺ এমন ইলম থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করতেন, যা উপকারে আসে না।[২৮] এক হাদিসে আছে, তিনি বলেন—

سَلُوا اللهَ عِلْمًا نَافِعًا، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

'আল্লাহ্‌র কাছে উপকারী ইলম প্রার্থনা করো। অনুপকারী ইলম থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাও।'[২৯]

আরেক হাদিসে রয়েছে—

إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا

'নিশ্চয়ই কিছু কিছু ইলম হলো অজ্ঞতা।'[৩০]

কথা অযথা দীর্ঘ করা এবং বক্তব্য প্যাঁচানোকে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ অপছন্দ করতেন। স্বাভাবিক কথা পছন্দ করতেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত রয়েছে, যা উল্লেখ করা হলে কলেবর বেড়ে যাবে। তেমনই ইমাম আহমাদ ﵀ এবং মুহাদ্দিস ইমামগণ— যেমন ইয়াহইয়া কাত্তান, ইবনু মাহদি এবং অন্যান্যরা— বিদয়াতিদের ধারা অবলম্বন করে ইলমুল কালামের কিয়াস আর আকলের দলিল ব্যবহার করে তাদের মতবাদ খণ্ডন করাকে অপছন্দ করতেন। তারা মনে করতেন, খণ্ডন হবে কুরআন সুন্নাহ্‌র নসের দ্বারা, আর সালাফের কোনো বক্তব্য পাওয়া গেলে তার দ্বারা। যদি তা কোনোটাই না পাওয়া যেতো, তবে নীরবতাকেই বেশি নিরাপদ মনে করতেন। ইবনুল মুবারক অথবা

---

[২৮] যাইদ রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম (২৭২২)

[২৯] সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৮৪৩

[৩০] সুনানু আবি দায়ুদ: ৫০১২

অন্য কোনো ইমাম বলতেন, আমাদের দৃষ্টিতে আহলুস সুন্নাহ্ তারা নয়, যারা প্রবৃত্তিপূজারীদের রদ করে; বরং তারা যারা এদের বিষয়ে নীরব থাকে। অনুপকারী ইলমের অপছন্দনীয়তার কারণে তিনি এ কথা বলেছেন, যা মানুষকে রাসুলের আনীত ইলম থেকে, তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী আমল থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কারণ রাসুলুল্লাহ্‌র আনীত ইলমের মাঝেই যথেষ্টতা রয়েছে। এটাও যার জন্য যথেষ্ট হয় না, আল্লাহ্ও তার জন্য যথেষ্ট হবেন না। এখানে আমি যা কিছু আলোচনা করেছি, আমি জানি, তর্ক-বিবাদপ্রিয়রা এর পর্যালোচনায় চরমভাবে মেতে ওঠবে, এর ওপর কড়া আপত্তি উত্থাপন করবে। কিন্তু সত্য যখন পরিস্ফুট হয়ে যায়, তখন তা মান্য করা অপরিহার্য হয়ে যায়। আর যারা এর ব্যাপারে আপত্তি তোলে, নিন্দা জানায়, বিবাদ করে এবং বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করাটাও অপরিহার্য হয়ে যায়। এখান থেকে এও জানা গেলো যে, ইমাম আহমাদ ও তাঁর পন্থা অবলম্বীরাই সবচে বেশি জ্ঞানী, মহান এবং সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। যাকে আল্লাহ্ ﷻ হকের দিকে হিদায়াহ্ দেন, তার জন্য এতেই যথেষ্টতা রয়েছে। আর আল্লাহ্ ﷻ যার জন্য নুর রাখেননি, তার কোনোই নুর নেই।

শেষ কথা

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এই বারাকাহ্‌পূর্ণ রিসালাহ্‌টি সমাপ্ত হলো। যে এই রিসালাহ্‌টির ব্যাপারে জানবে, তা পড়বে এবং তার আলোকে আমাল করবে, তার জন্য এই একটি রিসালাহ্‌ই ইনশাআল্লাহ্ যথেষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ই সঠিক বিষয় উপলব্ধির তাওফিকদাতা। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন এবং ফিরে যাওয়া।

‘এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তারা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে।’

(শারহু মুশকিলিল আসার: ৩৮৮৪; শুয়াবুল ইমান, বাইহাকি)

f www.facebook.com/SubutOnline
@ subutonline@gmail.com